The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 34, 2024 (P. 200-227)

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও জোট রাজনীতি (১৯৯১-২০২৩): সংবাদপত্রের ভূমিকা

হামিদা সুলতানা[১]

শাহাব উদ্দিন[২]

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোট গঠনের প্রবণতার দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যমের যে যাত্রা যেখানে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা, বিশেষভাবে জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে তা এ নিবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচন, জোট ও ভোট সংক্রান্ত নানা তথ্য তুলে ধরে সংবাদপত্র জনগণকে অবহিত করেছে, শিক্ষিত করেছে, বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় তুলে ধরেছে এবং সর্বোপরি জনভাবনাকে চিঠিপত্র-মন্তব্য-মতামতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছে। এই ভূমিকা সব সময় যথার্থ ছিলো কিনা তা যাচাই করা কঠিন। কেননা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহ দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ প্রকাশে যতটা তৎপর ছিলো, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্যে কর্তৃপক্ষের করণীয় তুলে ধরতে ততটা আন্তরিক ছিলো না। এ গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আধেয় বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশের তিনটি প্রাচীনতম দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদী ও সমকালীন আরও কিছু পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক জোট বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় কলামকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য শাখায় সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন থেকে গবেষণাধীন সংবাদপত্রসমূহে ১৯৯১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের নির্বাচনী জোটের নানা বিষয়কে উপজীব্য করে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় কলামসহ বিভিন্ন আধেয়কে সাংবাদিকতার অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দ: জোট রাজনীতি, গণমাধ্যম, সংবাদপত্রের ভূমিকা, আধেয় বিশ্লেষণ, সংসদীয় গণতন্ত্র।

১. ভূমিকা

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিন দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতি প্রধানত দুইটি ধারায় বিকশিত হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র নেতৃত্বে রাজনীতির প্রধান দুই ধারায় একাধিক জোট গঠিত ও পুনর্গঠিত

[১] প্রভাষক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: h.sultana.cu@gmail.com
[২] সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: sun@cu.ac.bd

হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এইসব জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কখনও বের হয়ে গিয়ে নতুন জোটে প্রবেশ করেছে। একই রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক জোটে যুক্ত হয়ে যুগপৎ আন্দোলন করেছে ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই সময়ে কেবল নির্বাচনে জয় লাভ নয়, কখনও কখনও সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক জোটের অনিবার্যতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে জোটবদ্ধভাবে সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে জোট রাজনীতির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়ও কর্তৃত্ববাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ববাদকে পরাজিত করতে বা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। নির্দিষ্ট দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ আন্দোলন বা নির্বাচন থেকেই জোট রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, সংস্কৃতি পরিবর্তন করা যায়। রাজনীতি বলতে সেসব কর্মকাণ্ডকে বুঝায় যা রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে অথবা পরিচালনায় সরকারকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে (Wiseman, 1969, p. 3)।

আধুনিককালে মানুষ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। আর মৌলিক জাতীয় স্বার্থবাহী সুনির্দিষ্ট কতগুলো দাবি আদায় ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অথবা স্বৈরশাসন অবসানকল্পে কিংবা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অথবা ইস্যুভিত্তিক অতি জরুরি কতগুলো উপস্থিত জনস্বার্থবিষয়ক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার কৌশল হিসেবে যখন ছোট-বড় একাধিক রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করে, তখন এটিকে রাজনৈতিক জোট বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে (রহমান, ২০০৮, পৃ. ৮৪-৮৫)। David Altman-এর মতে, রাজনৈতিক জোট হচ্ছে–

> ...যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অন্বেষণের জন্য দলসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের সাময়িক সমন্বয়। বিশেষভাবে এটা হলো সংসদীয় রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান যা একটি সাধারণ অভিষ্ঠ বা কতগুলো সাধারণ লক্ষ্য অন্বেষণে একমত পোষণ করে; সেই লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের সম্পদসমূহের সমাবেশ ঘটায়; সে লক্ষ্যকে ঘিরে প্রতিশ্রুতি দাঁড় করায় ও যোগাযোগ করে; (এবং) সেই লক্ষ্য অর্জন করতে মন্দ কিছুর ভাগ নিতেও সম্মত থাকে (Altman, 2000)।

নির্বাচনী জোট হলো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গের ঐক্য। সাধারণত দুইটি দলের মধ্যে এই ঐক্য হয়ে থাকে বলে নির্বাচনী জোটকে 'দ্বিদলীয় নির্বাচনী চুক্তি', রাজনৈতিক জোট নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে বলে 'নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি', নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়ী হলে সরকার গঠনের বিষয়ে সমঝোতা করে বলে একে 'নির্বাচনী চুক্তি', কখনও কেবল নির্বাচনকে ঘিরে গড়ে ওঠা ঐক্যের কারণে এটিকে

'নির্বাচনী মোর্চা' বা 'নির্বাচনী ব্লক' নামেও অভিহিত করা হয়। সাধারণত রাজনৈতিক দলসমূহ যখন নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব ও নীতি বিসর্জন না দিয়ে কিছু অভিন্ন লক্ষ্য ও দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলে তখনই রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি হয়। অতএব, কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল যদি মনে করে তারা এককভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারবে না, তখনই সমমনা রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জোট গঠন করা হয়। রাজনৈতিক জোটের কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো: জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য জোট গঠন করা হয়; রাজনৈতিক জোট মূলত একটি সাময়িক ব্যবস্থা, কেননা সঙ্কট উত্তরণের পর জোটভুক্ত দলসমূহ নিজেদের আদর্শ ও কর্মসূচি নিয়ে আগের বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে; জোটের রাজনীতি সাধারণত নেতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এ কারণে যে, ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটাতে বা আসন্ন নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত সরকার বা সরকারি দলের ভরাডুবি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণত জোট গঠন করা হয়; সাধারণত বহুদলীয় ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থে অথবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক জোট গঠন করে; ঐক্যই জোটের শক্তির উৎস ও যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলাই জোটের মৌল উদ্দেশ্য থাকে; এবং কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে যখন কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে অসমর্থ হয় বা প্রতিবন্ধকতায় পড়ে তখন রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতা দেখা দেয়।

২. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৯০ সালকে একটি বিশেষ মাইলফলক হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশের জন্মের চার বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশ দীর্ঘ সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায়। এই সময়ে দেশে রাজনীতির সুষ্ঠু বিকাশ হয়নি, রাজনৈতিক দলগুলো সুসংগঠিত হতে পারেনি, নির্বাচনী প্রক্রিয়াও হতাশাজনক অবস্থায় চলে যায়। দেড় দশকের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ নতুন পথে যাত্রা শুরু করে। এই যাত্রায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আশাবাদী হয়ে ওঠে, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায় এবং নবউদ্যমে বিকশিত হতে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক–সকল ক্ষেত্রে নবরূপে প্রাণশক্তি ফিরে আসে। এই অভুতপূর্ব পরিস্থিতি বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে রূপান্তরের দাবিকে সামনে নিয়ে আসে এবং ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনর্যাত্রা শুরু করে। এই যাত্রাপথে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলে, ভোট রাজনীতি ও জোট রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, বেতার-টেলিভিশন-অনলাইন-সামাজিক মাধ্যমসহ মুদ্রণ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়

গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের এই যুগপৎ বিকাশের দীর্ঘ যাত্রা পথে পরস্পর পরস্পরের জন্য কীভাবে অবদান রেখেছে তা অনুসন্ধান জরুরি। গণমাধ্যমের নানা শাখার মধ্যে কেবল সংবাদপত্র ও সংসদীয় রাজনীতির নানা মাত্রার মধ্যে কেবল জোট রাজনীতি নিয়ে এই নিবন্ধ পরিকল্পিত হয়েছে।

রাজনীতির সাথে গণমাধ্যমের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি যেমন নিবিড়ভাবে যুক্ত তেমনি সমাজের অত্যাবশ্যকীয় এই দুইটি বিষয় পরস্পরকে কীভাবে সহযোগিতা করে, রাজনীতি ও গণমাধ্যম পরস্পরের বিকাশে কী ভূমিকা পালন করে তা জানা জরুরি। বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক পরিবর্তন ও সার্বিকভাবে গণতন্ত্রের বিকাশে সংবাদপত্র কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে তা জানা ও এই দুইয়ের সহ-সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে এই গবেষণা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশে রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের ঘটনা উপস্থাপনে সংবাদপত্রের ভূমিকা যাচাই ছিলো এই গবেষণার লক্ষ্য। নিম্নোক্ত দুইটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই গবেষণাকর্ম পরিকল্পিত হয়:

১) বাংলাদেশে রাজনীতি বিষয়ে সাংবাদিকতা চর্চার প্রবণতা যাচাই ও

২) বাংলাদেশে জোট রাজনীতির তথ্য উপস্থাপনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনুসন্ধান।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (Historical analysis) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। আচরণ, মতামত ও বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণের জন্য প্রায়শই আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়। আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ হলো টেক্সট, ছবি, ভিডিয়ো ও অডিয়োর মতো গণমাধ্যমের বিভিন্ন ধরনের আধেয় অধ্যয়নের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি গবেষণা পদ্ধতি। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষকদের গণমাধ্যম আধেয়ের স্বরূপ, প্রতিপাদ্য ও অর্থ শনাক্ত করতে ও সেইসাথে নির্দিষ্ট ঘটনার পৌনঃপুনিকতা, ঘনত্ব ও বৈচিত্র্য পরিমাপ করতে সাহায্য করতে পারে। Wimmer ও Dominick-এর মতে, এই পদ্ধতিটি গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে জনপ্রিয়; কেননা এটি গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু অনুসন্ধানের একটি কার্যকর উপায় (Wimmer & Dominick, 2011 : 156)। নুয়েনডর্ফ আধেয় বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতি তুলে ধরে লিখেছেন, ‘সংক্ষিপ্তভাবে আধেয় বিশ্লেষণকে বার্তার বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতিগত, উদ্দেশ্যমূলক, পরিমাণগত বিশ্লেষণ হিসেবে

সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এতে মানুষের দ্বারা সংকেতবদ্ধকৃত বিশ্লেষণ ও কম্পিউটারের সহায়তায় পাঠ্য বিশ্লেষণ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর প্রয়োগসমূহে মুখোমুখি মানবীয় মিথষ্ক্রিয়ার সযত্ন পরীক্ষা; উপন্যাস থেকে অনলাইন ভিডিয়ো পর্যন্ত মিডিয়া ভেন্যুতে চরিত্রের চিত্রায়নের বিশ্লেষণ; সংবাদ মাধ্যম, রাজনৈতিক বক্তৃতা, বিজ্ঞাপন ও ব্লগে শব্দ ব্যবহারের কম্পিউটার-চালিত বিশ্লেষণ; ভিডিয়ো গেমিং ও সামাজিক মাধ্যম বিনিময়ের মতো মিথষ্ক্রিয় আধেয়ের পরীক্ষা ও আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে পারে (Neuendorf, 2017, p. 19)।' অনেক আধেয় সংখ্যাবাচক অবস্থায় থাকে না; যেমন-ছবি, প্রতীক বা চিহ্ন, কোনো কিছুর সংজ্ঞা, কোনো বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি। কাজেই, আধেয় বিশ্লেষণ কেবল সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ নয়, এটি গুণাত্মক বিশ্লেষণেরও একটি পদ্ধতি (Selltiz et.al, 1964, pp. 335-42)।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে দ্বিতীয় যে পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা হলো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হলো প্রমাণাদি পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অতীতের বিষয়ে সমঝোতায় আসার একটি পদ্ধতি। বিভিন্ন দলিল ও শিল্পকর্মের প্রমাণাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিকরা প্রথমে অতীতের বিষয়টির হদিস সম্পর্কে কিছু সত্য খুঁজে বের করেন এবং সেগুলোর অনুক্রম তৈরি করেন। দ্বিতীয়ত যে কাজটি করেন তা হলো, এসব সত্যাসত্যের কার্য-কারণ প্রতিষ্ঠা করেন যাতে কেন এমনটি ঘটেছে তা বোঝা যায় (Bricknell, 2008, p.108)। আর্কাইভভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বহুল ব্যবহার দেখা গেলেও বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় এ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে গুণাত্মক আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মিল রয়েছে।

এ নিবন্ধ রচনায় বিশেষভাবে তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। পত্রিকা তিনটি হলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের দুইটি প্রাচীনতম *দৈনিক সংবাদ* ও *দৈনিক ইত্তেফাক*, আর অন্যটি হলো চট্টগ্রামের প্রাচীনতম *দৈনিক আজাদী*। এছাড়া সমকালীন কিছু পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক জোট বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় কলামকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য শাখায় সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন থেকে গবেষণাধীন সংবাদপত্রসমূহে ১৯৯১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের নির্বাচনী জোটের নানা বিষয়কে উপজীব্য করে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় কলামসহ বিভিন্ন আধেয়কে সাংবাদিকতার অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি, রাজনীতিতে নির্বাচনী জোট ও সার্বিকভাবে দলীয় রাজনীতি ও জোটের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নানা ঘটনাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। রাজনীতি ও জোটের বিভিন্ন ঘটনা সমকালীন সংবাদপত্রে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে,

সেখানে কী ধরনের ঐতিহাসিক সত্য লুকায়িত আছে, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের সাথে এসবের কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে কিনা ও সে সম্পর্কের ধরন জানতে সংবাদপত্রের তথ্য বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোট গঠনের প্রবণতা নতুন নয়। রাজনৈতিক জোট গঠনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখানে তিনটি আলাদা পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রাসঙ্গিক সাহিত্যসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান শাসনামল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জোট রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রে বাংলাদেশের পুনর্যাত্রার পর ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী জোট রাজনীতিতে নানামুখী পরিবর্তন ঘটে তা আলোচনার পাশাপাশি ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দুইটি ভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১ বাংলাদেশে জোট রাজনীতি: ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে–যার পূর্বাংশে ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা বাঁধা পড়ে নতুন এক ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশে (Park and Wheeler: 1954, p. 129)। ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ সরকার ও তাদের সাথে জোটবদ্ধ আমলাগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থবিরোধী শাসনে বাঙালি তাদের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে (কাদের, ২০০৩, পৃ. ৮৮)। বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের ফলে পূর্ব বাংলায় একটি স্বতন্ত্র ধারার রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়। বিশেষ করে বাঙালির ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির গতি-প্রকৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনে (Jabeen, Chandio and Qasim, 2010, pp. 99-124)। মূলত এই আন্দোলনই বাঙালিকে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। ভাষা আন্দোলনের সময় গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ জোট দুইটি পাকিস্তানের পরবর্তী জোট রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ৬০)।

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর চারটি দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে এই রাজনৈতিক জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভুতপূর্ব বিজয় পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তী সময়ে একাধিক স্বল্প সময়ের জোট কেন্দ্র ও পূর্ব

বাংলায় সরকার গঠন করে। তাছাড়া, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট-এনডিএফ (১৯৬২), সম্মিলিত বিরোধী দল-কপ (১৯৬৪), পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন-পিডিএম (১৯৬৭), সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-স্যাক (১৯৬৯) ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ-ড্যাক (১৯৬৯)। ছাত্রসমাজ এবং রাজনৈতিক দলসমূহের জোটবদ্ধ আন্দোলনের কারণেই এক দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় করতে বাম সংগঠনসমূহের জোট হিসেবে ১৯৭১ সালের ১ জুন 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়। কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) আর্থিক আনুকূল্য ও সমর্থনে পরিচালিত এই কমিটি মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও ভারত সরকারের আধিপত্য সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে (Maniruzzaman, 2003, pp. 104-105)। কিছু দিনের মধ্যে মুজিবনগর সরকার একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক জোট হিসেবে ১৯৭১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আট সদস্যের 'সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠিত হয় (মুহিত, ২০০০, পৃ. ২৫৭-২৫৮)।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠন করে। অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকারের দাবিকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অপরাপর বিরোধী দলগুলো ক্ষুব্ধ হয় (খসরু, ১৯৯২, পৃ. ২৬)। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুজিব সরকারের পদত্যাগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও সর্বদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ১৫-দফা দাবি নিয়ে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দুইটি রাজনৈতিক জোটের আবির্ভাব ঘটে যার একটি সাত দলীয় জোট ও অপরটি ন্যাপ ও সিপিবির দ্বি-দলীয় জোট। ১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল ছয়টি দল নিয়ে 'সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয় (Maniruzzaman, 1975, p. 120)। সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের ২০ এপ্রিল ১১টি দল নিয়ে 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' ও ১৯৭৫ সালের শুরুতে পাঁচ শ্রমিক সংগঠন নিয়ে 'জাতীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। মুজিব শাসনামলের রাজনৈতিক জোটসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ত্রিদলীয় 'গণঐক্যজোট'।

জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল বা জাগদল গঠনের পর জাগদলসহ ছয়টি দলের সমন্বয়ে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামে নির্বাচনী জোট গড়ে তোলেন। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগসহ ছয়টি সেকুলার রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে

‘গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট’ গঠিত হয়। এ নির্বাচনকে ঘিরে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ডান ঘরানার কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ‘ন্যাশনাল ফ্রন্ট’ নামে আরেকটি রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ জোট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়ার বিরোধিতা করে এবং তৃতীয় আরেকটি ধারা তৈরির প্রচেষ্টা চালায় (Ahmed, 1995, p. 81)। বাংলাদেশে দ্বিতীয় সংসদের নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারিত হয় ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল ও রাজনৈতিক জোট এ নির্বাচনের বিরোধিতা করলেও পরবর্তীকালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয় (হাসানউজ্জামান, ২০০৯, পৃ. ২৭)। এ নির্বাচনকে ঘিরে ১৯৭৮ সালের শেষ দিকে ১০-দলীয় জোট গঠিত হয় (আবেদিন, ২০০৭, পৃ. ৪১২)। এ নির্বাচনকে ঘিরে ‘গণফ্রন্ট’ নামে আরও একটি জোট গড়ে ওঠে। জিয়ার শাসন বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পাঁচটি বামদলের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক জোট ও ১৯৮০ সালের শুরুতেও ১০টি রাজনৈতিক দলের একই রকম আরেকটি জোট গঠিত হয়।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরে ১৪টি দলের সমন্বয়ে ‘জাতীয় ফ্রন্ট’ গঠিত হয়। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরে এই জোটের বাম ঘরানার একটি অংশ বেরিয়ে ‘দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট’ নামে আরেকটি ছোট জোট গঠন করে। এ নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ একক প্রার্থী দিলেও আওয়ামী লীগ ১০-দলীয় জোটভুক্ত ছিলো। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে ‘নাগরিক কমিটি’ নামে চারটি দলের সমন্বয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। এছাড়া, ইসলামপন্থী চারটি দলের সমন্বয়ে ‘উলামা ফ্রন্ট’; বাম ঘরানার তিনটি দলের সমন্বয়ে ‘প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শিবির’; অপর তিনটি বাম দল নিয়ে ‘ত্রিদলীয় ঐক্যজোট’ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি জোটের পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগ সমমনা দলগুলো নিয়ে ১৫-দলীয় জোট গঠন করে (Uddin, 2006, p. 146)। ১৯৮৬ সালে ১৫-দলীয় জোট থেকে ‘পাঁচদলীয় বামজোট’ নামে আরেকটি রাজনৈতিক জোট তৈরি হলে ১৫-দল ছোট হয়ে আটদলীয় জোটে রূপ নেয়। এ সময় বিএনপির নেতৃত্বে সাতদলীয় জোট গঠিত হয় (Hassanuzzaman, 1998, p. 108)। ক্ষমতাসীন এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনদলের নেতৃত্বে ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট ‘জাতীয় ফ্রন্ট’ গঠিত হয়। এরশাদের শাসনামলে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে ১২-দলীয় ‘জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট’ অলি আহাদ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ছেড়ে ১৯৮৬ সালে ‘ছয়দলীয় জোট’, চীনপন্থী কমিউনিস্ট ঘরানার দলগুলো ১৯৮৭ সালের শুরুতে ‘গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট’, ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে ১১টি দলের সমন্বয়ে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে ইসলামি দলগুলোর ‘সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ’, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনকে ঘিরে ১৯টি ছোট ছোট দলের

সমন্বয়ে 'ইসলামি যুক্তফ্রন্ট', ১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করিমের নেতৃত্বে 'ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন'সহ বিভিন্ন নামে বহু জোট গঠিত হয়।

এরশাদের শাসনামলের শুরুতেই ১৯৮২ সালের শেষ দিকে ছাত্ররা জোটবদ্ধ হয় এবং ১৪টি ছাত্র সংগঠন একত্রিত হয়ে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তোলে। প্রথমে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের জোট হলেও পরে এতে সংগঠন সংখ্যা বেড়ে ১৯টিতেও দাঁড়িয়েছিল (সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪)। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শেষ দিকে ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর ২২টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' গঠিত হয় (Maniruzzaman, 1992, p. 207)। ছাত্রঐক্যের তীব্র আন্দোলনের মধ্যে আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলের সমন্বয়ে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিন জোটের রূপরেখা ঘোষিত হয় এবং ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদের নয় বছরের শাসনের অবসান হয়।

৪.২ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনী জোট: ১৯৯১-২০০৮

রাজনৈতিক জোটগুলোর যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং ৯০ দিনের মধ্যে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জোট এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯০ সালের শেষে বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করা হয় (হাসানউজ্জামান, ২০০৯, পৃ. ৩১)। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপির সরকার গঠনের জন্য আরও ১১টি আসনের প্রয়োজন ছিল। নির্বাচনে ১৮ আসনে বিজয়ী জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের এই ঐক্যে ফাটল ধরে এবং ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে জামায়াত আন্দোলনে নামে।

১৯৯২ সালের শুরুতে জামায়াতের আমির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ও বিচারের দাবিতে দেশে আন্দোলন শুরু হলে জামায়াত-বিএনপির ঐক্যে ভাঙন ধরে। আওয়ামী লীগ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে বিরোধী অবস্থানে থাকলেও সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে 'ত্রিদলীয় জোট' গড়ে তোলে। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সরকার বিরোধী নানা ইস্যুতে ত্রিদলীয় জোট যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যায়। সংসদ বর্জন, রাজপথে হরতাল, বিক্ষোভ, অবরোধ কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। মিরপুর উপনির্বাচন ও মাগুরা

উপনির্বাচনে সরকারি প্রভাব নগ্নভাবে ব্যবহার করার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অনেক জোরদার হয়। ভবিষ্যত জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে হবে বলে ত্রিদলীয় জোট দাবি জানায় (রেহমান, ২০০৮, পৃ. ১০০)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে ত্রিদলীয় জোট অভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৯৬ দিন হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচিতে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের পাশাপাশি একটি লাগাতার ৯৬ ঘণ্টা, দুইটি ৭২ ঘণ্টা ও পাঁচটি ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডাকা হয় (মাহমুদ, ২০১২, পৃ. ১৪৯)।

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সময়ে সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ (খালেক), জাসদ (ইনু), বাসদ (মাহবুব), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, সাম্যবাদী দল ও ঐক্য প্রক্রিয়া মিলে গঠন করে 'বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'। তারাও এ আন্দোলনে শামিল হয়।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। বিরোধী দলসমূহ এ চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে সংবিধান অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট মিলে চারদলীয় জোট গঠন করে (হক ও আলম, ২০১৪)।

চারদলীয় জোটের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও দলের সমাবেশ ঘটেছিল। এই জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে নীতি ও আদর্শগত মিলের পাশাপাশি লক্ষ্যগত একটা মিল ছিল এবং তাহলো ক্ষমতায় যাওয়া ও যে কোনোভাবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকিয়ে রাখা। জোট গঠনের পর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস অজিজুল হক এক যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন এবং ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন।

সরকার পতনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি, দুর্নীতি, সংসদে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ তুলে বিএনপি ১৯৯৭ সালে একক ও জোটবদ্ধভাবে ৯ দিনে ৮৭ ঘণ্টা ও ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ৫৮ দিনে ৭৭৮ ঘণ্টা অর্থাৎ মোট ৩৬ দিন ও ২০০১ সালে ১৮ দিনে ৩০৭ ঘণ্টা হরতাল পালন করে (আবেদিন, ২০০৭, পৃ. ৪৬২)। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা ছাড়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ ও চারদলীয়

জোটের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠানে চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল ও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আরও কিছু দলের কোনো নেতা বা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬)।

বিএনপি-জামায়াতের সখ্যতা ক্রমেই চারদলীয় জোটকে বিএনপি-জামায়াত জোটে পরিণত করে। ২০০৬ সালের শেষ দিকে বিএনপিতে কোণঠাসা ও ক্ষমতাবঞ্চিত শতাধিক নেতা নিয়ে 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এলডিপি' গঠিত হয়, জামায়াতের বিরুদ্ধে ইসলামি দলগুলো 'তিনদলীয় ইসলামি জোট' ও 'সম্মিলিত ইসলামি জোট' গঠন করে এবং খেলাফত মজলিস এক পর্যায়ে চারদলীয় জোট ছেড়ে গেলে এই জোট নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

এরশাদের জাতীয় পার্টি বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিক হলেও চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে 'ইসলামি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' নতুন রাজনৈতিক জোট গঠন করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে এরশাদ ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ৮-দফাকে সমর্থন দেয়। পরে চরমোনাই পিরের নেতৃত্বাধীন ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাথে জাগপা ও মুসলিম লীগসহ মোট পাঁচটি দলের সমন্বয়ে ইসলামি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলেন।

২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয় যেখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচন করে মাত্র ৬২ আসন লাভ করে। ইসলামি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এরশাদের জাতীয় পার্টি ১৪টি আসন পায়। এ নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচনী রাজনীতিতে জোট গঠনকে অনিবার্য করে তোলে।

চারদলীয় জোটের শাসনের শেষ দিকে উল্লেখযোগ্য জোট ছিল ১১-দলীয় বাম জোট। জোটের অংশীদার ছিল সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণফোরাম, সাম্যবাদী দল, বাসদ (খালেক), বাসদ (মাহবুব), গণতন্ত্রী পার্টি, গণ-আজাদী লীগ, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।

২০০৫ সালে ১১-দলীয় বাম জোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু হলে সিপিবি, বাসদের দুই অংশ ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ওই জোট থেকে বেরিয়ে যায়। অন্য সাতটি দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গঠনে এগিয়ে যায়। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় জাসদ (ইনু) ও ন্যাপ মোজাফ্ফর। গঠিত হয় ১৪-দলীয় জোট। এই জোট বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ভোটের হিসাব-নিকাশও ছিল তাতে। ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। মূলত, বাম ও প্রগতিশীল দলগুলো ছিল এর অংশীদার। ১৪-দলীয় জোটের শরিক দলগুলো

ছিলো–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন), বাংলাদেশ সাম্যবাদি দল (এম.এল.), বাংলাদেশ গণতন্ত্রী পার্টি, গণ-আজাদী লীগ, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বিএসডি), গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি), গণফোরাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও ন্যাপ (মোজাফফর)।

২০০৬ সালে সম্ভাব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট এরশাদের জাতীয় পার্টিকে জোটে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে শরিকদের সাথে টানা পোড়েনে জড়ায়। এরশাদ চারদলীয় জোটে যোগ দেবে ঘোষণা দিয়েও শেষ পর্যন্ত ১৪-দলীয় জোটে যোগ দেয়। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নবম সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এরশাদের জাতীয় পার্টি, জাকের পার্টি ও খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে ১৪-দলীয় জোট গঠন করে 'মহাজোট'। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে প্রার্থী দেয় মহাজোট এবং ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে সরকার গঠন করে।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচন যা পরে স্থগিত হয়ে যায়, তাকে ঘিরে ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম, নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারির তরিকত ফেডারেশন ও বদরুদ্দৌজা চৌধুরীর বিকল্পধারার সমন্বয়ে গঠিত হয় 'জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট'। এক পর্যায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান মাইজভাণ্ডারি। ড. কামালও বেরিয়ে যান ঐক্যফ্রন্ট থেকে। সংসদ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে তাঁরা আবারও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেন। গঠন করেন 'জাতীয় যুক্তফ্রন্ট'। গণফোরাম ও বিকল্পধারার পাশাপাশি এ দলে ছিলো ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর পিডিপি, জেনারেল ইব্রাহিমের কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ ফরোয়ার্ড পার্টি। পাঁচ দলের সমন্বয়ে গঠিত এ জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হলেও তারা কোনো বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

৪.৩ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনী জোট: ২০০৯-২০২৩

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের বিজয়ের পর ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি জোট নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ২৫ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশন শুরুর পর বিভিন্ন আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে পরিণত হয় জাতীয় সংসদ। ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত জোটের আলোচনা ও কোনো কর্মসূচি তেমনভাবে দৃশ্যমান ছিলো না। ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল চারদলীয় জোট বিলুপ্ত করে ১৮-দলীয় জোট গঠনের ঘোষণা আসে। এই জোটের শরিক দলগুলো হলো–বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট, বিজেপি, খেলাফত মজলিস, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, এলডিপি, কল্যাণ পার্টি, জাগপা, এনপিপি, লেবার পার্টি, এনডিপি,

বাংলাদেশ ন্যাপ মুসলিম লীগ, ইসলামিক পার্টি, ন্যাপ ভাসানী, ডেমোক্রেটিক লীগ ও পিপলস পার্টি। জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) ও সাম্যবাদী দল মিলে ১৮-দলীয় জোট একসময় ২০-দলীয় জোট হয়েছে। এক দশক চলার পর, ২০২২ সালের ৯ ডিসেম্বর বিএনপি ২০-দলীয় জোটে না থাকার বিষয়টি শরিক দলের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেয় (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ডিসেম্বর ২০২২)।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি পূরণ না হওয়ায় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট অংশ নেয়নি, তারা নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণা দেয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ আসনে প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়। শুধু তাই নয়, নির্বাচন পরবর্তী মহাজোট সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতেও ব্যর্থ হয় বিরোধী জোট। বরং পুরো মেয়াদে সরকারের চাপে কোণঠাসা ছিলো বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোট। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত করলেও জোটের গুরুত্ব কমতে থাকে। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জয়লাভ করে। তবে এবার আর মন্ত্রীসভায় জায়গা হয়নি শরিকদের কারোরই।

২০১৪ সালের নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমানের ও তরীকত ফেডারেশনের সাবেক মহাসচিব আবদুল আউয়ালের নেতৃত্বে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স নামে ধর্মভিত্তিক নতুন একটি জোট হয়। এই জোটের ১৪টি দলের একটিও নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত না হলেও তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকে (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ ডিসেম্বর ২০১৮)। ২০১৪ সালের নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে সম্মিলিত জাতীয় জোট নামে আলাদা একটি জোট গঠিত হয়। জাতীয় পার্টিসহ দুটি নিবন্ধিত দল আর নামসর্বস্ব মোট ৫৮টি দল নিয়ে এ জোট গঠিত হলেও নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। অন্যদিকে, বিএনপির সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (বিএনএ) নামে ৩৪-দলীয় জোট গঠন করে ক্ষমতাসীন জোটের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচিত আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট (বিএনএফ) নামে যে জোট আছে তাও আওয়ামীপন্থী হিসেবে পরিচিত।

২০১৪ সালের নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলো 'বাম গণতান্ত্রিক জোট'। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে বামপন্থী আটটি দল নিয়ে একটি জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বাইরে তৃতীয় শক্তি হিসেবে এই জোট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা চালায়। এই জোটের শরিকরা হলো–সিপিবি, বাসদ, বাংলাদেশের বিপ্লবী

ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। ২০১৮ সালের এক হিসাবে যে ১৪টি জোটের নাম পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ১২টিরই জন্ম হয়েছে নবম সংসদের মেয়াদকালে। এসব জোটে অন্তর্ভুক্ত দলের সংখ্যা ১৯৩ যেখানে কেবল ৩৯টিই নিবন্ধিত দল। একই দলের নাম সমমনা একাধিক জোটেও পাওয়া গেছে (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ ডিসেম্বর ২০১৮)।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে ছয়টি রাজনৈতিক জোটকে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এগুলো হলো–বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট, ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, বাম গণতান্ত্রিক জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট, মিছবাহুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ইসলামিক ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স, নাজমুল হুদার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট অ্যালায়েন্স (বিএনএ)। অন্যদিকে, জোটগতভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট, বাম মোর্চা, সিপিবি-বাসদ জোট, এরশাদের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত জাতীয় জোট, জাকির হোসেনের নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল জোট, শেখ ছালাউদ্দিন ছালুর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, আলমগীর মজুমদারের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক জোট (*বাংলা ট্রিবিউন*, ২১ মে ২০১৯)।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহাজোটের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ভরাডুবি হয়। টানা তৃতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার মেয়াদপূর্তির বছরে রয়েছে। বিএনপি স্পষ্টভাবে ২০-দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে এসেছে, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। আর পুরো পাঁচ বছর ধরে খুব একটা খবরে না থাকলেও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে ১৪-দলীয় জোটকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

২০২২ সালের আগস্টে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রাজনৈতিক জোট 'গণতন্ত্র মঞ্চ'। প্রকাশ্যে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে ৭ দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে নতুন এই জোট। এই জোটের শরিকরা হলো–নাগরিক ঐক্য, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, গণসংহতি আন্দোলন ও গণ অধিকার পরিষদ (*দৈনিক আজকের পত্রিকা*, ৮ আগস্ট ২০২২)। একই বছরে সরকারবিরোধী ১১ দলের নতুন জোট–'জাতীয়তাবাদী সমমনা

জোট' এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। জোটের শরিকেরা হলো–ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), সাম্যবাদী দল, ডেমোক্রেটিক লীগ, পিপলস লীগ, ইসলামী ঐক্যজোট (একাংশ), বাংলাদেশ ন্যাপ, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, গণদল, ন্যাপ ভাসানী ও বাংলাদেশ মাইনরিটি পার্টি (*দৈনিক আজকের পত্রিকা*, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২)।

২০২৩ সালের জানুয়ারির শুরুতে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নিতে ১৫টি সংগঠনের সমন্বয়ে 'সমমনা গণতান্ত্রিক জোট'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই জোটের শরিক দলগুলো হলো–ইয়ুথ ফোরাম, জিয়া নাগরিক সংসদ, ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট, শহীদ জিয়া আইনজীবী পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী নাগরিক দল, বাংলাদেশ জাস্টিজ পার্টি, সংবিধান সংরক্ষণ পরিষদ, গণতন্ত্র রক্ষা মঞ্চ, জাতীয়তাবাদী চালক দল, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা ৭১, ঘুরে দাঁড়াও বাংলাদেশ, মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল, দেশ রক্ষা মানুষ বাঁচাও আন্দোলন ও বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদ।

করোনা অতিমারির কারণে দুই বছরের বেশি সময় রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও এক ধরনের স্থবিরতা ছিল। আগে থেকেই জোটসমূহের নিয়মিত কার্যক্রম না থাকার কারণে করোনাকাল এই স্থবিরতাকে আরেকটু প্রলম্বিত করেছে। জোটের কোনো শরিকের বেরিয়ে যাওয়া অথবা জোটে নতুন শরিকের অন্তর্ভুক্তি জোট রাজনীতির স্থবিরতায় কখনও কখনও গতিময়তা আনে। মাঝে মাঝে বাংলাদেশ জাসদের ১৪ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা ২০ দলীয় জোট ছাড়লেন পার্থ বা খেলাফত মজলিসের ২০ দল ছাড়ার ঘটনা খবরের শিরোনাম হলেও এসব সংবাদ কোনো 'অর্থ' তৈরি করতে পারেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহ দৈনন্দিন ঘটনা হিসেবে জোট রাজনীতি, জোটের ভাঙা-গড়া, নতুন জোট তৈরি, জোটের স্থবিরতাসহ নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপনে যথেষ্ট তৎপর থেকেছে। কিন্তু এসব ঘটনার প্রেক্ষাপট ও সেগুলোর পরিণতি নিয়ে অনুসন্ধানী বা ব্যাখামূলক প্রতিবেদন প্রকাশে কম আগ্রহী ছিল। কিছু দৈনিক সম্পাদকীয় ও কলামে জোট রাজনীতি ও বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরলেও সেগুলো যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও গত তিন দশকের বেশি সময়ের নির্বাচনী রাজনীতিতে জোট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স হিসেবে এ বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কাজেই, রাজনীতি বিষয়ে সংবাদপত্রসমূহের সংবাদ প্রকাশে আগ্রহের বিপরীতে বিশ্লেষণধর্মী লেখা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জোট রাজনীতির নানা বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার উপায় অনুসন্ধানের অবকাশ তৈরি করেছে এই নিবন্ধ।

৫. রাজনীতি ও সংবাদপত্রের আন্তঃসম্পর্ক

রাজনীতির সাথে সংবাদপত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, একে অপরের পরিপূরক। রাজনীতি হলো সংবাদ মাধ্যমের প্রাণ এবং রাজনীতিকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র তথা বিভিন্ন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র জনমত গঠন থেকে শুরু করে এর বহুমুখী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। কাজেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংবাদপত্রের আধেয়ের মধ্যে রাজনীতি বেশ বড় স্থান দখল করে থাকে। রাজনীতি নিয়ে, দেশের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গেলে বড় আধার হিসেবে সামনে আসে সংবাদপত্রের নাম।

রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে ব্যক্তি মানসিকতার উন্নয়ন–সর্বত্রই গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। সারাবিশ্বের সামগ্রিক ধারণা তৈরিতে গণমাধ্যম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলমান ইতিহাস রচিত হয়। ম্যাককুইলের মতে, গণমাধ্যম বা গণযোগাযোগের এক একটি ধরন (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদি) শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সমাজ কাঠামোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফোর্সও বটে (McQuail, 2002)। গ্র্যাবার লিখেছেন, গণমাধ্যম আমাদের জীবন ও চিন্তাকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমের তথ্য নিয়ে আমরা অবধারণগত জগতের বাস্তবতা নিরূপণ করি এবং বাস্তবতাকে নির্মাণ করি (Graber, 1988)। রিভার্স লিখেছেন, কখনোবা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী ও এলিট শ্রেণির বক্তব্য ও আদর্শকে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বাহন হিসেবেও কাজ করে গণমাধ্যম (Rivers, 1966, pp. 1-12)। মার্কিন সাংবাদিক ওয়ালটার লিপম্যান এর মতে, সাংবাদিকরা জনগণ ও নীতি নির্ধারণী এলিটদের (রাজনীতিক, নীতি নির্ধারক, আমলা, বিজ্ঞানী) মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। সংবাদকর্মীরা এলিট শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবার কথা শোনে, দেখে এবং জনগণকে শোনার, দেখার ও পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এই দেখা, শোনা ও লেখা ছুঁয়ে যায় অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি সর্বত্র। লিপম্যান তাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ হিসেবে দেখেন গণমাধ্যমকে।

গণমাধ্যম তার বিভিন্ন আধেয় দ্বারা জনগণকে সচেতন করে, সজাগ করে ও জাগ্রত করে (Dominick, 2009, pp. 23-29)। গণমাধ্যম দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করে (Severin & Tankard, 1988, pp. 303-304)। সকল প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে গণমানুষকে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়। গণমাধ্যমকে সহায়ক শক্তি (Schramm, 1964) হিসেবে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্রত হয় ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা, দেশ ও সর্বোপরি পুরো জাতি।

এ. এস. এম. মোহসীন তার অভিসন্দর্ভে লিখেছেন, সংবাদপত্র সম্পর্কিত গবেষণা মূলত দুইভাগে বিভক্ত–সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রণয়ন এবং সমসাময়িক ও জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা নির্ধারণ। সংবাদপত্রের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো জনমতের প্রতিফলন ও জনমত গঠনে এর শক্তিশালী ভূমিকা। সংবাদপত্রের পাতায় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের লেখা প্রবন্ধ ও অভিমত, কলাম লেখকদের তর্কবিতর্ক, যুক্তি প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন, পত্রিকার নিজস্ব সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিষয়ে জনমত গঠনে সাহায্য করে (মোহসীন, ২০১৯, পৃ. ৩)।

৬. জোটের রাজনীতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা

জোটের রাজনীতি কিংবা ভোটের রাজনীতিতে জোট নির্বাচনের সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে একটি জনপ্রিয় ও নিয়মিত আধেয়ে পরিণত হয়েছে। দেশে পাঁচ বছরে একবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসে, গণমাধ্যমসমূহ সে নির্বাচনকে ঘিরে প্রায় বছরখানেক আগে থেকে নির্বাচনি সাংবাদিকতার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এর বাইরে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনে জোটের ভূমিকা, নির্বাচন পরবর্তী জোটসমূহের অবস্থা, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দলগত অবস্থানের পাশাপাশি জোটগত অবস্থানের নানা দিক নিয়েও সময়ে সময়ে বিভিন্ন আধেয় ওঠে আসতে দেখা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশি সময়ের সরকারকে কোনো জোটবদ্ধ আন্দোলন মোকাবেলা করতে হয়নি। একইভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলেও জোটবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের খবরাখবর সংবাদপত্রে তেমন প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি। তবে জোট গঠন, রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ–এ ধরনের কিছু সংবাদ সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর তার শাসনামলের প্রায় পুরো সময়জুড়ে বিরোধীদলসমূহ বিভিন্ন জোট গঠন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এসব আন্দোলন কর্মসূচির নানা খবরাখবর সমকালীন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

এরশাদ তার পুরো শাসনামলে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোকে নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাসে কেবল ঘুরিয়েছে তা নয়, সংবাদপত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে কেবল দৈনন্দিন ঘটনার খবরাখবর প্রকাশের বাইরে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশেও নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলো। *দৈনিক সংবাদ* ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে *দৈনিক ইত্তেফাক* বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বক্তব্য তুলে ধরলেও অপরাপর সংবাদপত্রসমূহকে নীরবই মনে হয়েছে।

১৯৯১ সালের ৮ জানুয়ারি *দৈনিক আজাদী*তে প্রকাশিত হয় আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী প্রকাশের খবর। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলামজুড়ে এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'জোটগত নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরত থাকার শর্ত সাপেক্ষে ২৯৭টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের মনোনয়ন ঘোষণা' (*দৈনিক আজাদী*, ৮ জানুয়ারি ১৯৯১)। পরদিন বিএনপির প্রার্থী মনোনয়নের খবরটি *দৈনিক সংবাদে* প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জোট ও দলের সাথে আলোচনার পর চূড়ান্ত তালিকা ॥ বিএনপি'র ২৯২টি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা' (*দৈনিক সংবাদ*, ৯ জানুয়ারি ১৯৯১)। তার পরদিন ১৯৯১ সালের ১০ জানুয়ারি *দৈনিক আজাদী*র প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় বাকশালের মনোনয়নদানের খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'জোট মনোনয়ন দিলে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহারের শর্তে ২৪৪টি আসনে বাকশালের মনোনয়ন ঘোষণা' (*দৈনিক আজাদী*, ১০ জানুয়ারি ১৯৯১)। জোটগতভাবে দীর্ঘ আন্দোলনের পর এরশাদ সরকারের পতন হলেও ১৯৯১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো জোটগতভাবে নয়, দলীয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সরকার গঠনের জন্য কোয়ালিশন করতে হয়। ১৯৯১ সালে ১ মার্চ সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়া প্রয়োজনে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা বলেন। *দৈনিক সংবাদের* প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলাম শিরোনামে প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল: 'সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে খালেদা জিয়া ॥ প্রয়োজনে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা বিবেচনা করা হবে' (*দৈনিক সংবাদ*, ২ মার্চ ১৯৯১)। এ খবরটি *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ খবরের শিরোনাম ছিল: 'প্রয়োজনে কোয়ালিশন ॥ সংসদ সরকার পদ্ধতি স্থির করিবে- খালেদা জিয়া' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ ১৯৯১)।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন বিরোধী দল ও জোট কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করার সংবাদটি *দৈনিক ইত্তেফাকের* প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলামে দিনের প্রধান সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ খবরের শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সাথে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ॥ নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ॥ প্রধানমন্ত্রীসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ॥ সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন ॥ বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুন ১৯৯৪)। এ খবরটি *দৈনিক আজাদী*তে প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলামে প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল: 'বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা আজ ঘোষণা করবে' (*দৈনিক আজাদী*, ২৮ জুন ১৯৯৪)।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন বিষয়ক একটি খবর *দৈনিক সংবাদের* প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ খবরের

শিরোনাম ছিল: 'উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন ॥ কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না'। এ খবরে বলা হয়:

> জাতীয় উৎসবের আমেজে গতকাল বুধবার সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশের কয়েকটি স্থানে সহিংস ঘটনা ছাড়া নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব ছিল বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর। ভোটগ্রহণ পর্বে দেশের কোথাও থেকে বড় ধরনের কোন কারচুপি, ভোট চুরি, ভোট ডাকাতির খবর পাওয়া যায়নি। নির্বাচনে মহিলা ভোটারের উপস্থিতি ছিল স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে এসেছেন ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততায়। গভীর রাতে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বেসরকারি যে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেছে তাতে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই (*দৈনিক সংবাদ*, ১৩ জুন ১৯৯৬)।

২০০০ সালের ২৫ জুলাই পল্টন ময়দানে এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন বেগম খালেদা জিয়া। এ খবরটি *দৈনিক আজাদী*র প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পল্টনে সমাবেশে খালেদা জিয়া ॥ আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠন জোটগতভাবেই হবে'। এ খবরে বলা হয়: 'জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বিরোধী জোটের আন্দোলনে ভীত হয়ে সরকার জোট ভাঙার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু কোনো ষড়যন্ত্রেই কাজ হবে না (*দৈনিক আজাদী*, ২৬ জুলাই ২০০০)।'

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত বেসরকারি ফলাফলে চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনে চারদলীয় জোট ও বিএনপির বিস্ময়কর সাফল্য, নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা, গণতন্ত্রের বিজয় ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালের ২ অক্টোবর *দৈনিক সংবাদে* 'নির্বাচন ২০০১' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এ সম্পাদকীয়ে নির্বাচন দিনে দুই নেত্রী, প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ বিভিন্ন পক্ষের মতামত ও অবস্থানের একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয় এবং নির্বাচনের ফল যাই হোক না কেন মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয় (*দৈনিক সংবাদ*, ২ অক্টোবর ২০০১)। পরদিন ৩ অক্টোবর *দৈনিক সংবাদে* প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের টাইটেল ছিল: 'সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়'। এ সম্পাদকীয়ে এবারের নির্বাচনকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে অভিহিত করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করার সুপারিশ করে বলা হয়: 'এক কথায়, জাতীয় নির্বাচনের এ পর্বের যেন দ্রুত সমাপ্তি ঘটে তার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান

জানাচ্ছি। আমরা যেভাবেই দেখি না কেন এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্ন নিয়ে যত প্রশ্নই থাকুক না কেন, এবারের জাতীয় নির্বাচন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত করেছে। এটি ধরে রাখতে হবে (*দৈনিক সংবাদ*, ৩ অক্টোবর ২০০১)।'

অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে, বিশেষভাবে জোটগতভাবে নির্বাচনের ফলে ভোটের হিসাবে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তার নানা দিক তুলে ধরে সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ৪ অক্টোবর ২০০১ *দৈনিক আজাদী*তে 'অষ্টম সংসদ নির্বাচন ও অতঃপর-' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়ে পূর্ববর্তী ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সাথে ২০০১ সালের নির্বাচনে দলীয় ভোট প্রাপ্তির হার আগের মতো রয়ে গেছে ও নতুন ভোটারদের ভোটও আনুপাতিক হারে বিভক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, 'তবে জোট গঠনের ফলে সংখ্যাতাত্ত্বিক সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে শতকরা সাত থেকে দশ ভাগ ভোটের পার্শ্বপরিবর্তনের ফলে জোট এই নির্বাচনী সাফল্য অর্জন করেছে (*দৈনিক আজাদী*, ৪ অক্টোবর ২০০১)।'

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটগতভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনকে ঘিরেও জোট-মহাজোটের নানা সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় মতামতে ভরপুর ছিলো সংবাদপত্রসমূহ। সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই এ আলোচনা ও বিশ্লেষণ অব্যাহত থাকে। দলীয়ভাবে যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্ত থাকায় জামায়াতের সাথে বিএনপির জোট গঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী দৈনিক *প্রথম আলো:*

> বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি জোট বাঁধে এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে। জোট থেকে এমন অনেককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনী জোট গঠনের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শগত ক্ষেত্রে ঐক্য বা অন্তত প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন। দলগুলো কেন ও কীসের ভিত্তিতে জোট গঠন করেছে, তা জনগণ তথা ভোটারদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল (*দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০০৮)।

নির্বাচনী ফলাফল ও কার্যক্রম সম্পর্কে ৩১ ডিসেম্বর 'এই বিজয় অভূতপূর্ব' শিরোনামে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়: 'নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিপুল অর্থের ছড়াছড়ি, রং-বেরং পোষ্টার, লিফলেট, গেট নির্মাণ ইত্যাদি বিত্ত-বৈভবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার সুযোগ বলতে গেলে ছিল না। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এসব নির্বাচনী আচরণ-বিধি প্রার্থীরা মেনে চলতে বাধ্য হয়েছেন নির্বাচন

কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের সজাগ দৃষ্টি ও কঠোর ভূমিকার কারণে (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮)।

একই ধরনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে গবেষণায়ও। আহম্মেদ শরীফ তার অভিসন্দর্ভে লিখেছেন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী জোট ও আসন ভাগাভাগির জোর তৎপরতা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। নির্বাচনে জয়লাভ ও ভবিষ্যতে সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে জোট গঠন বা এ নিয়ে দলগুলোর মধ্যে দর কষাকষি অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদর্শ বা নীতি-নৈতিকতা বলে যে কিছু আছে, তা একেবারেই উপেক্ষিত থাকবে এটা কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারে না। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগ বা মহাজোটের ঐক্য ও আসন ভাগাভাগি নিয়ে অনেকেই নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু নির্বাচনে জেতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বৈরশাসনের জন্য নিন্দিত এরশাদের সঙ্গে জোট বাঁধার বিষয়টি নৈতিকতার বিবেচনায় মেনে নেওয়া কঠিন (শরীফ, ২০১৪, পৃ. ১৮০)।

বিবিসি বাংলায় ১৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে 'সংসদ নির্বাচন ২০১৮: বাংলাদেশে নির্বাচনী জোট দলগুলোর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনী জোটের গুরুত্ব অনুসন্ধান করা হয়। এতে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ের নীতি-নির্ধারকরাই নির্বাচনী জোটকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য এ ধরনের জোট যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ছোট দলসমূহের বিভিন্ন বক্তব্য বৃহৎ পরিসরে ওঠে আসার ক্ষেত্রেও জোট একটি পাটাতন হিসেবে কাজ করছে বলে তারা মনে করছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ভাবনাকে তুলে ধরে প্রতিবেদনের ইতি টানা হয়েছে এভাবে–'বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জোটবদ্ধ নির্বাচনের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পাবে (*বিবিসি বাংলা*, ১৬ নভেম্বর ২০১৮)।'

বাংলাদেশ প্রতিদিনে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 'জোটের রাজনীতি ভোটেই শেষ ॥ গত জাতীয় নির্বাচনের আগে আটটি জোটের দৌড়ঝাঁপ ছিল, এখন সবই নিষ্ক্রিয়, একলা চল নীতিতে প্রধান দুই দল' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়:

> ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ক্রমেই জোটের রাজনীতিতে ভাটা পড়ে। প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এখন অনেকটাই একলা চল নীতিতে এগোচ্ছে। শরিক দলগুলো এখন অনেকটাই গুরুত্বহীন। সর্বশেষ সরকারের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই মেলেনি শরিক জোটের কোনো নেতার। ক্ষোভে ফুঁসলেও মুখ ফুটে বলছেন না কেউই। অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপি ২০-দলীয়

জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে এড়িয়ে চলছে। জাতীয় পার্টি, যুক্তফ্রন্ট বা বিএনএ জোটের তো কোনো অস্তিত্বই নেই (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন *প্রথম আলো*র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বাংলাদেশে বড়জোর পাঁচটি দলের নিজ শক্তিতে জয়ী হওয়ার ক্ষমতা আছে। জোট-মহাজোটে দলের সংখ্যা মনস্তাত্ত্বিক খেলামাত্র। এর মাধ্যমে রাজনীতির গুণগত কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ ডিসেম্বর ২০১৮)।'

জোট রাজনীতি ও নির্বাচনে এর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও ভিন্নমতও দেখা যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিনাত হুদা *ঢাকা পোস্ট*কে বলেছেন, 'ভোটের রাজনীতিতে জোট কোনো প্রভাব ফেলে না। জোটের গঠন বিষয়টি প্রতীকী ও মনস্তাত্ত্বিক।' আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জোট গঠনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'উভয়পক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে তাদের সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক দল আছে। আর জোট থাকলে নেতাকর্মীদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব থাকে (*ঢাকা পোস্ট*, ১৬ মার্চ ২০২১)।' বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি ও নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট গঠনের ক্রমাগত ধারা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ মতটিও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনীতি ও গণমাধ্যমের মধ্যকার সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলসমূহ সে ইতিহাসের উত্তরাধিকার। কাজেই, জোটের রাজনীতি ও বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে গবেষণাধীন সংবাদপত্রসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক। জোট গঠন, জোটের ভাঙন, জোটের নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তা সম্পর্কিত খবরাখবর সংবাদপত্রে যেমন নিয়মিতভাবে ওঠে এসেছে তেমনি জোট রাজনীতির নীতি-নৈতিকতা, রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে জোটসমূহের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে সংবাদপত্র। কখনও সংবাদে, কখনও সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয় কলামে সংবাদপত্রকে এসব বিষয়ে নানা জিজ্ঞাসাকে সামনে হাজির করতে দেখা গেছে। কাজেই, সংবাদ ও অন্যান্য আধেয় তুলে ধরে গণমাধ্যম কেবল জোটের খবর প্রচার বা প্রকাশ করে তাদের দায়িত্ব শেষ করেনি, বরং জোটের আদর্শ-উদ্দেশ্যকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনার চেষ্টা করেছে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশে অন্তর্বর্তী সরকার, পরবর্তী সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুণর্যাত্রা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিভিন্ন নির্বাচন ও এসব নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের কখনও একক ও কখনও জোটগতভাবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনী জোটের গতি-প্রকৃতি বিস্তৃত হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসন, রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিদেশি শক্তিসমূহের ভূমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম গঠনমূলক ভূমিকা

পালন করেছে। কাজেই, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও দেশের রাজনীতিকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন সাংবাদিকতা চর্চার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

৭. আলোচনা ও উপসংহার

গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিদ্যায়তনিক আলোচনায় সংবাদমাধ্যমের যে ভূমিকাগুলো প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো–অবহিতকরণ বা জ্ঞাতকরণ, শিক্ষিত করা, প্রভাবিত করা ও বিনোদিত করা। এর বাইরে গণমাধ্যমের আরও যেসব ভূমিকা দেখা যায় সেগুলো হলো–শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি জনগণকে পরিচালিত করা, জনমত গড়ে তোলা, জনমতকে সরকারের কাছে প্রবাহিত করা, সরকার ও কর্তৃপক্ষের করণীয় নির্দেশ করা, গণমাধ্যমের ভোক্তা ও আধেয় উৎপাদনকারীর মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর থেকে, বিশেষভাবে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণমাধ্যম তার আদর্শিক ভূমিকার প্রায় সবগুলোই পালন করছে। নির্বাচন, জোট ও ভোট সংক্রান্ত নানা তথ্য তুলে ধরে সংবাদপত্র জনগণকে অবহিত করেছে, শিক্ষিত করেছে, বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় তুলে ধরেছে এবং সর্বোপরি জনভাবনাকে চিঠিপত্র-মন্তব্য-মতামতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছে। এই ভূমিকা সব সময় যথার্থ ছিলো কিনা তা যাচাই করা কঠিন। কেননা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহ দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ প্রকাশে যতটা তৎপর ছিলো, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্যে কর্তৃপক্ষের করণীয় তুলে ধরতে ততটা আন্তরিক ছিলো না।

গণমাধ্যম সমাজে আলোচ্যসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে। যদিও গণমাধ্যমের এই ভূমিকা পালনের বিষয়টি এখন নানা প্রশ্নের মুখোমুখি–গণমাধ্যম আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে, না অন্য কোথাও নির্ধারিত আলোচ্যসূচি ফেরি করে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সম্পাদিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দৈনিকগুলো তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ব্যবসায়িক নীতিমালার সঙ্গে মিথোজীবিতামূলক সম্পর্কে আবদ্ধ রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী-জোট বা ঐক্যের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নিজেদের অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে সংবাদ উপস্থাপন করেছে (ফয়সল ও উদ্দিন, ২০২০)।

জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশে আলোচিত রাজনৈতিক জোটসমূহের কেন্দ্রে রয়েছে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট গত দেড়

দশকেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান। এছাড়া ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী ধারার 'মহাজোট' ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি ধারার 'ঐক্যফ্রন্ট' ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বর্তমানে রাজনীতির মাঠে অন্তত ১৪টি জোটের নাম পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ জোটই গুরুত্বহীন হয়ে আছে। কেননা, জোটের রাজনীতি ভোটের পরে গুরুত্ব হারিয়েছে। বড় দলগুলোর একলা চলো নীতির কারণে জোট শরিকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে গঠিত জোটের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে নানাভাবে রাজনৈতিক জোটের জন্ম হয়েছে–নির্বাচন এলে জোট, সরকারের বিরোধিতা করতে সরকারবিরোধী জোট, সরকার গঠন করতে জোট। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভোট আর সরকার বিরোধী রাজনীতি হলো জোটের রাজনীতির প্রধান অনুষঙ্গ। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ভোটের রাজনীতিতে দলের চেয়ে জোটের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনগুলোর ফল বিশ্লেষণ করলে এই চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল জোটকে প্রাধান্য দিচ্ছে। পঞ্চম থেকে দশম সংসদ নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, জোটের রাজনীতিই ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এই সময়ে জাতীয় পার্টি ও জামায়াত প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

সামরিক স্বৈরশাসন, অপশাসন, দুর্নীতি, বৈষম্য ও শোষণের দীর্ঘ পরিক্রমায় পথচ্যুত গণতন্ত্রকে রাজনীতির মাঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক জোটসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এককভাবে একটি দলের পক্ষে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা যখন কঠিন হয়েছে কিংবা সামরিক শাসনের ছায়ার নীচে নাগরিক অধিকারের পক্ষে কথা বলা যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তখন ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সব জোট। রাজনীতির মাঠে এসব জোট যেমন শত্রু-মিত্র খুঁজে পেতে সহায়ক হয়েছে তেমনি গণতন্ত্র ও গণমানুষের রাজনীতিকেও স্পষ্ট করেছে। স্বৈর শাসকরা নিজেদের শাসনকালকে দীর্ঘ করতে গিয়ে কখনো রাজনৈতিক এসব জোটে ভাঙন ধরিয়েছে, কখনো লোভ দেখিয়ে নতুন জোট তৈরি করে ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনকে পথহীন করতে চেয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯০ পরবর্তী জোট রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে বেশি বেশি ব্যবহার হওয়া ও জোট গঠনের ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শের পরিবর্তে ভোটের হিসাব মুখ্য হয়ে উঠায় রাজনীতির ময়দানে নির্বাচনী জোটের ঐতিহ্য তার গৌরবের অনেকটাই হারিয়ে বসেছে। আগামীদিনের রাজনীতিতে নির্বাচনী জোট কীভাবে ভূমিকা রাখে সংবাদসমূহে তার উপস্থাপন পরবর্তী গবেষকদের ভাবনার খোরাক যোগাবে।

সংবাদপত্রসমূহ যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলসমূহের দায়িত্বও অনেক। নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটসহ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ সংবাদপত্রকে স্বাধীন ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রের জন্য সহযোগিতামূলক আচরণের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করতে পারে। রাজনৈতিক দলসমূহ ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও তা একেবারে নিঃশেষ করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও অপরাপর গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত হয়ে আছে। এই বিভাজন বাংলাদেশের গণমাধ্যমের শক্তিকে খর্ব করেছে। গণমাধ্যম এখন সরকারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে, তার পরিবর্তে সরকারের প্রশংসায় একজন অপরজনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে সংবাদকর্মী ও সংবাদপত্রসমূহ রাজনীতি ও সরকারের ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকতে পছন্দ করছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে স্বাধীন ভূমিকা পালনের জন্য মালিকের স্বাধীনতার বিপরীতে সাংবাদিকের স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সাংবাদিকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হলে অনেকক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন বিষয়ে দর কষাকষি করতে পারবে। বিষয়টি কঠিন হলেও সাংবাদিকদের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনে বিভাজন ভুলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা দরকার।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহ ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নানামুখী পরিবর্তন ঘটছে তার ছোঁয়া গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও লেগেছে। এই পরিবর্তন সব সময় যে ইতিবাচকভাবে ঘটেছে তা নয়। তবে ইতিবাচক পরিবর্তন বা উন্নয়নের ঘটনাও কম নয়। সংবাদপত্রসমূহ অনলাইন মাধ্যমের দাপটের বিপরীতে যেমন টিকে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ তেমনি এর ক্ষমতা খর্ব হওয়ার কারণে অনেকক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালনে সমর্থ নয়। আইনি বেড়াজাল, বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ, গণমাধ্যম একীভূতকরণ, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সর্বোপরি সাংবাদিকদের মধ্যে বিভাজন গণমাধ্যমকে পূর্বের তুলনায় কম ক্ষমতার অধিকারী করেছে, সমাজে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে কমিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে দুর্বলতর অবস্থানে নিয়ে গেছে। আমাদের আশা, বাংলাদেশের গণমাধ্যম অচিরেই ঘুরে দাঁড়াবে, তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে এবং সমাজে সঠিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য নির্দেশ

আজকের পত্রিকা, ৮ আগস্ট ২০২২, সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে 'গণতন্ত্র মঞ্চের' আত্মপ্রকাশ, https://www.ajkerpatrika.com/226659/ সরকার-বিরোধী-আন্দোলনের-ঘোষণা-দিয়ে-'গণতন্ত্র

আজকের পত্রিকা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, সরকারবিরোধী নতুন ১১ দলীয় জোটের আত্মপ্রকাশ, https://ajkerpatrika.com/politics/ajpvpep65p21

আবেদিন, এস এম জয়নুল (২০০৭), *বাংলাদেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫), *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

কাদের, রেজিনা (২০০৩), 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে গণসংগীতের ভূমিকা: ১৯৬৯-৭১', *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা-৮৭।

খসরু, আমীর (১৯৯২), *সামরিক শাসন এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন*, ঢাকা: এফ. রহমান।

ঢাকা পোস্ট, ১৬ মার্চ ২০২১।

দৈনিক আজাদী, ৮ জানুয়ারি ১৯৯১।

দৈনিক আজাদী, ১০ জানুয়ারি ১৯৯১।

দৈনিক আজাদী, ২৮ জুন ১৯৯৪।

দৈনিক আজাদী, ৭ নভেম্বর ১৯৯৪।

দৈনিক আজাদী, ৭ মে ১৯৯৮।

দৈনিক আজাদী, ২৬ জুলাই ২০০০।

দৈনিক আজাদী, ৩ অক্টোবর ২০০১।

দৈনিক আজাদী, ৪ অক্টোবর ২০০১।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ ১৯৯১।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জুন ১৯৯৪।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ নভেম্বর ১৯৯৪।

দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ডিসেম্বর ২০২২।

দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০৬।

দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০১৮, আনোয়ার হোসেন, ভোটের রাজনীতি 'জোটবন্দী', https://www.prothomalo.com/politics/ভোটের-রাজনীতি-'জোটবন্দী'।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ডিসেম্বর ২০২২, '১২ দলীয় জোটের আত্মপ্রকাশ ॥ ভেঙ্গে গেছে ২০ দলীয় জোট', https://www.ittefaq.com.bd/625330/ভেঙে-গেছে-২০-দলীয়-জোট

দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি ১৯৯১।

দৈনিক সংবাদ, ২ মার্চ ১৯৯১।

দৈনিক সংবাদ, ৭ নভেম্বর ১৯৯৪।

দৈনিক সংবাদ, ১৩ জুন ১৯৯৬।

দৈনিক সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০০১।

দৈনিক সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০১।

দৈনিক সংবাদ, ১০ অক্টোবর ২০০১।

ফয়সল, হাসান মাহমুদ ও উদ্দিন, শাহাব (২০২০), নির্বাচনবিষয়ক সংবাদের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ : প্রসঙ্গ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮, *The Jahangirnagar Review*, Part-C, Vol. XXX, pp 233-258, ISSN 2306-3920, https://juniv.edu/journal/11236/file.

বাংলা ট্রিবিউন, ২১ মে ২০১৯, আদিত্য রিমন, 'নির্বাচনি জোটগুলোর খবর কী?' https://www.banglatribune.com/politics/473309/ নির্বাচনি-জোটগুলোর-খবর-কী।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

বিবিসি বাংলা, ১৬ নভেম্বর ২০১৮, আকবর হোসেন, 'সংসদ নির্বাচন ২০১৮: বাংলাদেশে নির্বাচনী জোট দলগুলোর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?', https://www.bbc.com/bengali/news-46241472

মাহমুদ, মো. সুলতান (২০১২), 'বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমস্যা: একটি পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষা', *ডেভেলপমেন্ট কমপাইলেশন*, ভলিউম: ০৭, নং: ০১।

মোহসীন, এ. এস. এম. (২০১৯), *বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯৪৭-৭১ (মার্চ)*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহিত, আবুল মাল আবদুল (২০০০), *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ।

রহমান, তারেক এম, তাওফীকুর (২০০৮), 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', *বাংলাদেশ: রাজনীতির চার দশক*, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

রেহমান, তারেক শামসুর (২০০৮), 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৭৩-২০০১', *বাংলাদেশ: রাজনীতি চার দশক*, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

শরীফ, আহম্মেদ (২০১৪), *বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র: ১৯৯১-২০০৮*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪।

হক, সাহাবুল ও আলম, বায়েজীদ (২০১৪), *বাংলাদেশের জোট রাজনীতি (১৯৫৪-২০১৪)*, ঢাকা: অবসর ।

হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

Ahmed, M. (1995). *Democracy and the Challenge of Development: A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Altman, D. (2000). *Coalition Formation and Survival under Multiparty Presidential Democracies in Latin America: Between the Tyranny of the Electoral.* Paper presented at the Latin American Studies Association, Miami.

Bricknell, D. (2008). Historical Analysis', In Richard Thorpe and Robin Holt (Ed.). *The Sage Dictionary of Qualitative Management Research*, Sage Publications Ltd.

Dominick, J. R. (2009-10th Edition). *The Dynamics of Mass Communications*. Boston: McGraw-Hill.

Graber, D. A. (1988). *Processing the News: How People Tame the Information Tide.* New York: Longman.

Hassanuzzaman, A. M. (1998). *Role of Opposition in Bangladesh Politics*. Dhaka: University Press Limited.

Jabeen, M., Chandio, A. A., and Qasim, Z. (2010). Language Controversy: Impacts on National Politics and Secession of East Pakistan. *South Asian Studies,* Vol. 25, No. 1.

Maniruzzaman, T. (2003). *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*. Dhaka: Mowla Brothers.

Maniruzzaman, T. (1992). The Fall of Military Dictator: 1991 Elections and the Prospects of Civilian Rule in Bangladesh. *Pacific Affairs, 65*(2).

Maniruzzaman, T. (1975). Bangladesh in 1974: Economic Crisis and Political Polarization. *Aian Survey, 15*(2).

McQuail, D. (2002). *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publications Ltd.

Neuendorf, K. A. (2017). *The Content Analysis Guidebook* 2nd Edition. Sage Publications, Inc.

Park, R. L., and Wheeler, R. S. (1954). East Bengal under Governor's Rule. *Far Eastern Survey, 23*(9).

Rivers, W. L. (1966). *The Opinionmakers.* Beacon Press, Boston.

Schramm, W. L. (1964). *Mass media and national development: the role of information in the developing countries.* Stanford: Stanford University Press.

Selltiz, C., M. Jahoda, D. M., and Cook, S. (1964). *Research Methods in Social Relations*. NewYork: Holt, Rinehart & Winston.

Severin, W. J. & Tankard, J. W. (1988), *Communication Theories,* New York: Longman.

Uddin, AKM J. (2006). *The Movement for the Restoration of Democracy in Bangladesh 1982-1990: A Study of Political Sociology*. Unpublished PhD Dissertation, The University of Leeds.

Wiseman, H. V. (1969). *Politics: the Master Science.* London: Routledge and Kegan Paul.

Wimmer, R. D., and Dominick, J. R. (2011). *Mass Media Research: An Introduction,* 9th Edition. USA: Wadsworth.